Learning Resource

B.Sc. 2nd Semester Honours
Economics
GE 2T: Introductory Macroeconomics

Prof. Supratik Guha

Unit-III: Inflation

ভূমিকা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামগ্রিক দামস্তরের উপর নির্ভরশীল। সময়ের ব্যবধানে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দামস্তরের উঠানামা হয়ে থাকে। যখন দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় তখন দেশে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। দামস্তরের ক্রমাগত উর্ধ্বগতি এবং দামস্তরের ক্রমাগত নিম্নগতি উভয়ই একটি দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। মূল্যস্ফীতি বেশি পরিমাণে হলে ধনী গরিবের অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে জনগণের সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে বিনিয়োগের জন্য মূলধনের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে বিনিয়োগ কম হয়ে দেশের উৎপাদন কম হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের পরিমান কম হওয়ায় বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আবার এই সকল পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এই ইউনিটে মূল্যস্ফীতি ও এর কারণ এবং ফলাফল সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পেতে পারি।

মূল্যস্ফীতির ধারনা ও পরিমাপ
Concept of Inflation and Measurement

মূল্যস্ফীতির ধারনা

সাধারণত সামগ্রিক দামস্তরের বৃদ্ধিকে মূল্যস্ফীতি বলে। মূল্যস্ফীতি বলতে এমন একটি অবস্থা বুঝায় যে, একই পরিমান দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে পূর্বের তুলনায় বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। অর্থাৎ বলা যায় যে, মূল্যস্ফীতি হলে অর্থের মূল্য কমে যায়। সাধারণত কোন একটি দেশের অর্থনীতিতে যখন অর্থের যোগান বৃদ্ধির ফলে দ্রব্য সামগ্রীর কার্যকর চাহিদা বাড়ে অথচ সে তুলনায় দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন যদি না বাড়ে তখন দেশের সামগ্রিক দামস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই সময় অর্থের মূল্য তথা জনগনের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়।

মূল্যস্ফীতি সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা নিম্নে দেওয়া হল :

অর্থনীতিবিদ্ ক্রাউথার (*Crowther*) বলেন, "মুদ্রাস্ফীতি হল এমন এক অবস্থা যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।"

অর্থনীতিবিদ্ কুলবর্ন (*Coulborn*) এর মতে, "মুদ্রাস্ফীতি হল এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ অতি সামান্য পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়।"

অধ্যাপক হট্রে (*Hawtrey*) বলেন, "অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।"

অধ্যাপক পিগু (*Pigou*) বলেন, "যখন আয় সৃষ্টিকারী কাজ অপেক্ষা মানুষের আর্থিক আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।"

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (*Samuelson*) এর মতে, "দ্রব্যসামগ্রী এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে, সাধারণভাবে তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।"

লর্ড কেইন্‌স (*Keynes*) এর মতে, "যখন দ্রব্য সামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় কার্যকর চাহিদা বেশি হয় তখন সেই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।"

ক্ল্যাসিকেল অর্থনীবিদদের মতে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিই হলো মুদ্রাস্ফীতি। মনিটারিস্টরা মনে করেন যে, অর্থের অতিরিক্ত যোগান বৃদ্ধির কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেইনসের মতে, পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার পর অর্থের চাহিদার চেয়ে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, যখন দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত মোট দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হয় এবং তার ফলে দ্রব্যমূল্য বা দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে অবস্থাকেই 'মুদ্রাস্ফীতি' (Inflation) বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ (Types of Inflation)

মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির কারণ এবং দামস্তর বৃদ্ধির গতিবেগের ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদ্গণ মুদ্রাস্ফীতিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। বিভিন্ন প্রকার মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

(ক) কারণ অনুসারে প্রকারভেদ :

১। **অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Currency induced inflation):** যখন কোন দেশের সরকার কর্তৃক প্রচলিত অর্থের যোগান বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় তখন তাকে 'অর্থ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়।
সাধারণত সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত কাগজী নোট ছাপানোর ফলে এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

২। **ঋণ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Credit induced inflation):** যখন কোন দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ বাজারে ছাড়ে তখন দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মূল্যবৃদ্ধিকে 'ঋণজনিত মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয় ।

৩। **মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Wage induced inflation):** অনেক সময় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ফলে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটে। এ ধরনের মূল্য বৃদ্ধিকে 'মজুরি বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়।

৪। **মুনাফা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Profit induced inflation):** অনেক সময় উৎপাদনকারীদের মুনাফা বৃদ্ধির ফলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মূল্য বৃদ্ধিকে 'মুনাফা বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি' বলা হয় ।

৫। **আয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Income induced inflation):** অনেক সময় উৎপাদনের উপাদানগুলোর আয় বৃদ্ধির ফলে দেশে দামস্তর বৃদ্ধিপায়। এ ধরনের মূল্য বৃদ্ধিকে 'আয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়।

৬। **ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Deficit induced inflation):** যখন কোন দেশে যুদ্ধ বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় অথবা উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তখন সরকার ঘাটতি ব্যয়নীতি অনুসরণ করে। এর ফলে দেশে অর্থের যোগান ও দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মূল্য বৃদ্ধিকে 'ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়।

৭। **চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand pull inflation):** অনেক সময় কোন দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা অন্য কোন কারণে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অর্থাৎ সামগ্রিক যোগানের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এভাবে সমাজে সামগ্রিক যোগানের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দামস্তরের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে 'চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' বা চাহিদা প্রণোদিত মুদ্রাস্ফীতি' (Demand pull inflation) বলা হয়।

৮। **ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost push inflation):** শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের দাম বৃদ্ধির ফলে দামস্তরের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে তাকে 'ব্যায় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' (Cost push inflation) বলা হয়।

(খ) দামস্তরের গতিবেগের ভিত্তিতে প্রকারভেদ:

দামস্তরের বৃদ্ধির গতির ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

(১) মৃদু মুদ্রাস্ফীতি
(২) পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি
(৩) উল্লম্ফন মুদ্রাস্ফীতি।

১। **মৃদু মুদ্রাস্ফীতি (Mild inflation):** যখন দামস্তর ধীরগতিতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাকে 'মৃদু মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেশের অর্থনীতিতে খুব একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বরং অনেকের মতে, উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা সহায়ক।

২। **পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি (Walking inflation):** যখন দামস্তর অপেক্ষাকৃত অধিক হারে হাঁটার গতিতে বাড়তে থাকে তখণ তাকে 'পদসঞ্চারী মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশ প্রকট হয়ে তা অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর হয়।

৩। **অতি- মুদ্রাস্ফীতি বা উল্লম্ফনশীল মুদ্রাস্ফীতি (Hyper inflation or Galloping inflation):** যখন দামস্তর অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে তখন তাকে 'অতি মুদ্রাস্ফীতি' বা 'উল্লম্ফনশীল মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়। অর্থনীতির চূড়ান্ত অস্বাভাবিক অবস্থায় এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এ অবস্থায় দামস্তর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে এবং অর্থের মূল্য দ্রুত হ্রাস

পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়েছিল, সাম্প্রতিককালে জিম্বাবুয়েতে এ জাতীয় মুদ্রস্ফীতি দেখা গিয়েছে।

(গ) নিয়ন্ত্রনের ভিত্তিতে প্রকারভেদ:

(১) অবাধ মুদ্রাস্ফীতি

(২) দমিত মুদ্রাস্ফীতি

১। অবাধ মুদ্রাস্ফীতি: সরকারি কর্তৃপক্ষ যদি মূল্য বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোন রকম চেষ্টা না করে এবং মূল্যবৃদ্ধি অবাধ গতিতে বা বাধাহীনভাবে চলতে থাকে তখন তাকে 'অবাধ মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়।

২। দমিত মুদ্রাস্ফীতি: দামস্তর বৃদ্ধির গতিকে যখন বিভিন্ন সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তখন তাকে 'দমিত মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা; যেমন- দ্রব্যের সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ, রেশনিং ব্যবস্থা, ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে 'নিয়ন্ত্রন বা দমিত মুদ্রাস্ফীতি' বলা হয়।

(গ) কেইনসীয় প্রকারভেদ:

অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেইন্স নিয়োগ পরিস্থিতির ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

(১) প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি

(২) আংশিক মুদ্রাস্ফীতি

১। প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি: লর্ড কেইন্স এর মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন দেশে প্রচুর অব্যবহৃত সম্পদ থাকে ততক্ষন পর্যন্ত কোন দেশে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে না। কারণ, অর্থের যোগান বাড়লে দেশে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং দ্রব্যের যোগানও বাড়বে। এ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু যখন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ণ বিনিয়োগ অবস্থায় পৌছে তখন আর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। এরূপ অবস্থায় অর্থের যোগান বাড়ালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে। এরূপ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

২। আংশিক মুদ্রাস্ফীতি: পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্বেও অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধকের দরুন উৎপাদন ব্যয় বেড়ে কিছুটা মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করতে পারে। যেমন- অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ উপাদানের অভাব হয়ে পড়ে। ফলে ঐসব দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও দাম বেড়ে যায় এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপরও এর প্রতিক্রিয়া হয়। সাময়িকভাবে এরূপ মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। এভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থানের পূর্বে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

মূল্যস্ফীতির কারণ ও প্রভাব
Causes of Inflation and Impact

মূল্যস্ফীতির কারণসমূহ-

একটি দেশের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি একটি জটিল সমস্যা। মূল্যস্ফীতি বিভিন্ন কারনে ঘটতে পারে। যেসব কারণে মূল্যস্ফীতি হয়ে থাকে তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

১। অর্থের যোগান বৃদ্ধিঃ মূল্যস্ফীতির অন্যতম কারন হল অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে জনগনের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অর্থের যোগান বৃদ্ধির সাথে যদি দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন সামঞ্জস্য হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা কম থাকে। তবে অর্থের যোগান বৃদ্ধির সাথে যদি সামঞ্জস্যহারে দ্রব্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পায় না, তাহলে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়।

২। সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় : অনেক সময় সরকারকে আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করতে হয়। এ ব্যয়ের অর্থ সরকার যদি জনসাধারনের নিকট হতে ঋণের মাধ্যমে গ্রহণ করে তাহলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করেন অথবা বিদেশ হতে ঋণ গ্রহণ করে এবং দেশের অভ্যন্তরে তা খরচ করে তবে তার ফলেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অধিক ঋণদানঃ দেশে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে তাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মজুদও বৃদ্ধি পায় এবং তারা ব্যবসায়ী, শিল্পপতিগণকে সহজ শর্তে অধিক ঋণ দান করে। ফলে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

৪। উৎপাদন হ্রাসঃ কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনের স্বল্পতা মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতির ফলে অনেক সময় কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হয়। অর্থের যোগান ঠিক থেকে যদি দ্রব্যাদির উৎপাদন কমে যায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৫। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্তঃ আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যখন একটা দেশের অবস্থা অনুকুল হয়, তখন সেই দেশের লোকের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে মুদ্রস্ফীতি ঘটে।

৬। ভোগ ও বিনিময় ব্যয় বৃদ্ধি : সমাজে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটে। কারণ, ভোগব্যায় ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে সে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৭। মজুরি বৃদ্ধিঃ মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সংঘ অত্যন্ত শক্তিশালী । তারা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করে মালিকদেরকে মজুরি বৃদ্ধি করতে বাধ্য করে। এভাবে মজুরি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনকারীরাও দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৮। **অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধিঃ** মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হল অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। সরকার অনুৎপাদনশীল খাতে যেমন - শিশুপার্ক, স্টেডিয়াম নির্মান প্রভৃতি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করলে জনগনের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে; কিন্তু উৎপাদন বাড়ে না। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৯। **প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ** মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। দেশে বন্যা, খরা, ঝড়, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উৎপাদন বিশেষ করে কৃষি উৎপাদন ব্যহত হয়। এর ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

১০। **চোরাকারবারি ও মজুতদারীঃ** মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হল চোরাকারবারি ও মজুতদারী। চোরাকারবারিরা অধিক লাভের আশায় দেশীয় উৎপাদিত পণ্য দেশের বাইরে পাচার করে দ্রব্যসামগ্রীর ঘাটতি সৃষ্টি করে। একইভাবে মজুতদাররা অবৈধভাবে দ্রব্যসামগ্রী মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। এর ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

১১। **ঘাটতি ব্যয়ঃ** উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো ঘাটতি ব্যয়। উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য সরকারকে ঘাটতি ব্যয় নীতি অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকার দেশের ভেতর থেকে অথবা বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

১২। **যুদ্ধজনিত ব্যয় নির্বাহঃ** মুদ্রাস্ফীতির আর একটি প্রধান কারণ হল যুদ্ধজনিত ব্যয়। কোন দেশ যখন যুদ্ধাবস্থার সম্মুখীন হয় তখন সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এ বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ গ্রহণ বা কর ধার্য করে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় সরকার অতিরিক্ত কাগজী নোট ছাপিয়ে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। এর ফলে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতির আর্থ-সামাজিক ফলাফল

মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সমাজের উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মূল্যস্তর এবং আয় বন্টনের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলঃ

(ক) উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতি বিশেষ করে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি দেশের উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। মূল্যস্তর মৃদুভাবে বাড়তে থাকলে মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ, ব্যবসায়ী ও উৎপাদকগণ যে দামে কাচামাল ক্রয় করে দ্রব্য উৎপাদন করে তার তুলনায় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে বেশি দাম পেয়ে থাকে। ফলে তারা অধিক মুনাফা লাভ করে। মুনাফার পরিমান বেড়ে গেলে তারা উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে দেশের মোট উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, মৃদু মুদ্রাস্ফীতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য। অবশ্য উৎপাদন, কর্মনিয়োগ, জাতীয় আয় প্রভৃতির উপর মুদ্রাস্ফীতির এ শুভ প্রতিক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় যতক্ষণ দেশ পূর্ণ নিয়োগস্তরে না পৌছে। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগস্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাহলে মূল্যবৃদ্ধি উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয় না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করে এবং দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ সময় ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারিগণ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে ফটকা কারবারের দ্বারা দ্রুত মুনাফা অর্জন করতে আগ্রহী হয়। ফলে দেশের প্রকৃত উৎপাদন কমে যায়। তাছাড়া অর্থের ক্রয়শক্তি দ্রুত কমতে থাকে, বলে সঞ্চয়কারী সঞ্চয়ের পরিবর্তে ভোগ ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। ফলে মূলধণ গঠন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চরম মুদ্রাস্ফীতির সময় উদ্যোক্তাগণও উৎপাদন ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির ফলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ও নিয়োগ কমে আসে।

(খ) আয় বন্টনের উপর প্রভাব

মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থ ও সম্পদ এক শ্রেণীর লোকের হাত হতে অন্য এক শ্রেণীর লোকের হাতে চলে যায়। ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়।

১। মুদ্রাস্ফীতির সময় নির্দিষ্ট আয়ের লোকেরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের প্রকৃত আয় কমে যায় এবং তারা আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মূখীন হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তিরা তাদের আয় দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানহ্রাস পায়।
২। মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমিক শ্রেণীও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় শ্রমিকদের মজুরি কিছুটা বাড়তে পারে; কিন্তু মূল্যস্তর যে হারে বাড়ে মজুরি তা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে। ফলে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমে যায় এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়।
৩। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেনাদাররা লাভবান হয়; কিন্তু পাওনাদারেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় দেনাদার বা ঋণগ্রহিতারা অপেক্ষাকৃত কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেনার অর্থ পরিশোধ করতে পারে। অপরপক্ষে, মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণ দাতা বা পাওনাদারেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফিরে পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।
৪। মুদ্রস্ফীতির ফলে কৃষিজীবিগণ লাভবান হয়। মুল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় খুব একটা বাড়ে না, অথচ কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। এ জন্য কৃষিজীবিগণ লাভবান হয়, তবে ভূমিহীন খেতমজুরেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
৫। মুদ্রাস্ফীতির ফলে করদাতাগণের সুবিধা হয়। কারণ, করদাতাগণ পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদান করতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারি ঋণের প্রকৃত ভার কমে যায়। কারণ, নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারকে পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ প্রকৃত সম্পদ ব্যয় করতে হয়। তবে কর গ্রহণের দিক হতে সরকার মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ, সরকার কর হতে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক আয় পায় তার প্রকৃত মূল্য মুদ্রাস্ফীতির সময় কমে যায়।
৬। যে সমস্ত নিয়োগকারীরা শেয়ার ক্রয়ে অর্থ বিনিয়োগ করে তারা মুদ্রাস্ফীতির সময় লাভবান হয়। তবে যে সমস্ত বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট সুদ লাভের জন্য বণ্ড বা ডিবেঞ্চারে অর্থ বিনিয়োগ করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

(গ) মূল্যস্তরের উপর প্রভাবঃ

মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাধারণ মূল্যস্তর এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির সময় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজের ব্যয়োপযোগী আয়ের পরিমাণ বেড়ে মোট চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দেশে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার পূর্ব পর্যন্ত চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। ফলে দাম স্তর বাড়তে পারে না; কিন্তু দেশ পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌছানোর পর দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় জিনিসপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ায় দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি ঘটে। তাই মুদ্রাস্ফীতি যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহলে শ্রমিকরা অধিক মজুরি দাবি করে। মুদ্রাস্ফীতির সময় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং সে সাথে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দ্রব্যমূল্য আরও বেড়ে যায়। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে উৎপাদন ব্যয় এবং মুল্যস্তর বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) সামাজিক প্রভাবঃ

মুদ্রাস্ফীতির সামাজিক প্রভাবও শুভ নয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি পায় তাতে সমাজে ধনী শ্রেণী অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় ধনীরা আরও ধনী হয় এবং দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির সময় সমাজের আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। ফলে সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য দাবি করে। এর ফলে অনেক সময় শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট এবং অন্যান্য রকমের শ্রমিক-মালিক বিরোধ এবং সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময় এক শ্রেণীর লোক অধিক মুনাফা লাভের আশায় চোরাচালান, দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি, কালোবাজারি প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। ফলে সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটে।
সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির দেশের অর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রনের উপায়

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাকে মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে; যথা- (ক) আর্থিক ব্যবস্থা, (খ) রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা এবং (গ) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি।

(ক) আর্থিক ব্যবস্থাঃ

মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণই হল অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে হলে অর্থের পরিমাণ কমাতে হবে। এ অর্থের পরিমাণ কমাতে হলে ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণও কমাতে হবে। কারণ, বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের সাহায্যে বহু লেনদেন হয়ে থাকে। এ ঋণের পরিমাণ কমাতে পারলে মোট প্রচলিত অর্থের পরিমাণ কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধানঃ

১। ব্যাংক হার বৃদ্ধিঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে হারে বানিজ্যিক ব্যাংককে টাকা ধার দেয় তাকে ব্যাংক হার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বাড়ালে বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের সুদের হার সাধারণত বাড়িয়ে দেয়। ফলে ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে এবং ঋনের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বাড়িয়ে দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

২। খোলাবাজারি কারবারঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ কমাতে চেষ্টা করে। এরূপভাবে ঋণপত্র বিক্রয় করলে ক্রেতাগণ তাদের নিজ নিজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর চেক কেটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাওনা মিটিয়ে তাকে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকের রিজার্ভের হার পরিবর্তন, নৈতিক চাপ প্রয়োগ, প্রত্যক্ষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মুদ্রাস্ফীতি দূর করার চেষ্টা করে।

(খ) রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা

বর্তমানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা অপেক্ষা ফিসক্যাল ব্যবস্থা বা সরকারি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি অনেক বেশি কার্যকরী। লর্ড কেইনস্ সর্বপ্রথম এ নীতি অবলম্বন করার জন্য পরামর্শ দেন। মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ হল অতিরিক্ত ব্যয়। কাজেই ব্যয়ের পরিমাণ কমাতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সরকার যদি আয়-ব্যয় নীতি এমন ভাবে প্রচলন করেন যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে যায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতির চাপও কমে যাবে। ফিসক্যাল ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধানঃ

১। সরকারি ব্যয় হ্রাসঃ সরকারি ব্যয় দেশের মোট ব্যয়ের পরিমাণের একটা মোটা অংশ। কাজেই মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারি ব্যয় কমানো উচিত। সরকারি খাতে যথাসম্ভব অনাবশ্যক বয় বন্ধ করা উচিত। উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশেষ করে যেসব পরিকল্পনায় দ্রব্যাদি বিলম্বে উৎপন্ন হয় সেগুলোকে সাময়িকবাবে স্থগিত রাখতে হবে।

২। অতিরিক্ত কর ধার্যঃ মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের আর একটা প্রকৃত উপায় হল করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। বেশি করে কর দিতে হলে জনসাধারণের হাতে ব্যয়যোগ্য আয় কমে যায়। কাজেই মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমে যায়। নতুন নতুন কর ধার্য করে এবং পুরাতন করের হার বাড়িয়ে লোকের ক্রয় ক্ষমতা কমানো যেতে পারে। অবশ্য করের হার বৃদ্ধি করার সময় প্রত্যক্ষ করের হার বাড়ানো উচিত এবং আমদানি শুল্ক না বাড়িয়ে রপ্তানি শুল্ক বাড়ানো উচিত।

৩। সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণঃ মুদ্রাস্ফীতি নিরোধনের জন্য সরকার জনগনের নিকট হতে অধিক পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এতে জনসাধারনের উদ্বৃত্ত আয় সরকারের হস্তগত হওয়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৪। সঞ্চয়ের উৎস প্রদানঃ সরকার জনসাধারনকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করেও মোট ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস কনরতে পারে। সুদের হার বাড়িয়ে দিলে জনসাধারণ অধিক পরিমাণে সঞ্চয়ে আগ্রহী হবে। এর ফলে ব্যয়ের পরিমাণ কমে যাবে এবং দামস্তর হ্রাস পাবে।

(গ) প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রনের জন্য আর্থিক নীতি ও রাজস্বনীতির প্রয়োগ ছাড়াও সরকার কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এগুলোকে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা হয়। প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ

১। সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণ: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার পণ্যসামগ্রীর দামের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে। এভাবে পণ্যসামগ্রীর সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য বেধে দেওয়া হলে দামস্তর একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়।

২। ন্যায্য মূল্যের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যায্যমূল্যে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্য সরকার 'ন্যায্য মূল্যের বিক্রয় কেন্দ্র' স্থাপন করতে পারে। এছাড়া সরকার রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে পারে। এর ফলে দামস্তর হ্রাস পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়।

৩। মজুরি নিয়ন্ত্রণ: মুদ্রাস্ফীতির সময় শ্রমিকগণ মজুরির হার বাড়ানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করে। তাদের অধিক মজুরি দেয়ার ফলে উৎপাদন ব্যয় এবং মূল্যস্তর বেড়ে যায়; তখন শ্রমিকেরা পুনরায় মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে। এরূপে ক্রমাগতভাবে মূল্যস্তর ও মজুরি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে জন্য অনেক সময় আইন করে বা আপসের মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধি বন্ধ রাখা যায়।

৪। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা: অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কিছুটা কমানো যেতে পারে।

৫। মুদ্রা অবৈধকরণ: মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করলে অনেক সময় পুরাতন মুদ্রা পরিত্যাগ করে নতুন মুদ্রার প্রচলন করা হয়। কোন কোন সময় বেশি মূল্যের নোটকে অচল করে দেওয়া হয়।

৬। গচ্ছিত অর্থ আটক: মুদ্রাস্ফীতির সময় জনসাধারণ বিশেষ করে ধনী ব্যাক্তিরা যাতে বেশি অর্থ ব্যয় করতে না পারে সে জন্য অনেক সময় সরকার তাদের ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ সাময়িকভাবে আটক করে রাখে। এর ফলে এ অংশ ব্যয় করা সম্ভবপর হয় না। ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে।

মুদ্রাস্ফীতি নিঃসন্দেহে একটি জটিল ও গুরুতর সমস্যা। কোন একটা বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে তা দূর করা সম্ভব নয়। এ জন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে আর্থিক নীতির পাশাপাশি রাজস্বনীতির প্রয়োগ সহ বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান: কোন দেশে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে সামগ্রিক চাহিদা যদি সামগ্রিক যোগানকে অতিক্রম করে তবে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দেখা দেয়। Professor Lipsy বলেন, "Inflationary gap is the amount by which aggregate expenditure would exced aggregate output of the full employment level of income."

মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূরীকরণের উপায়সমূহ

পূর্ণ নিয়োগ স্তরে সামগ্রিক যোগানের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান সৃষ্টি হয়। তাই মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর করতে হলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে:

১। **সরকারি ব্যয়:** মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর করতে হলে সরকারি ব্যয় হ্রাস করতে হবে। বিশেষ করে অনুৎপাদনশীল ও অনুন্নয়ন খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারি ব্যয় হ্রাস করা হলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে আসবে এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে। এর ফলে চলতি আয় হ্রাস পেয়ে পূর্ণ নিয়োগস্তরে ফিরে আসবে এবং মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান বা মুদ্রাস্ফীতি ফাঁক দূর হবে।

২। **কর বৃদ্ধি:** করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাস পায়। এর ফলে ভোগব্যয় কমে আসে। এ অবস্থায় সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে। এর ফলে দ্রব্যমূল্য কমবে ও চলতি আয় হ্রাস পেয়ে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ফিরে আসবে এবং মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর হবে।

৩। **সরকারের ঋণ গ্রহণ:** সরকার দেশের ভিতরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে জনগণের ব্যক্তিগত ব্যয় সংকুচিত হয় এবং সামগ্রিক চাহিদা কমে যায়। এ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূরীভূত হয়।

৪। **বাধ্যতামূলক সঞ্চয়:** মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর করার জন্য সরকার জনগণকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের একাংশ নগদে প্রদান না করে ঋণপত্র ও বন্ডের আকারে প্রদান করা যেতে পারে। এর ফলে জনগণের হাতে নগদ অর্থ কমবে এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে ও মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর হবে।

৫। **সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি :** মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করতে পারে। খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে অর্থনীতিতে ঋণ সরবরাহ কমে আসবে এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর হবে।

৬। **সুদের হার বৃদ্ধি:** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ চাহিদা হ্রাস পায়। এর ফলে বিনিয়োগ সংকুচিত হয় এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। এভাবে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেলে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূরীভূত হয়।

৭। **আমদানি বৃদ্ধি:** মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূরীকরনের অন্যতম উপায় হল বিদেশ থেকে আমদানি বৃদ্ধি। কারণ মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান মূলত পূর্ণ নিয়োগ স্তরে উদ্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে দেশীয় পণ্যের যোগান বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না। এ অবস্থায় বিদেশ থেকে ভোগ্যপণ্য ও বিনিয়োগ দ্রব্য আমদানি করে দেশে সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি করা যায়। এর ফলে সামগ্রিক চাহিদা যোগানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান দূর করা যায়।

এ সব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ যে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান বা ফাঁক সৃষ্টি হয় তা দূরীভূত হয়।